দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
017

তারিখ 16 FEB 1987
পৃষ্ঠা 6 ... 6

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

মফিজউদ্দিন আহমদ

সাধারণতঃ মানুষ তার মায়ের মুখ থেকে ভাষা শিখে থাকে। সে জন্যই সকলেরই ভাষাকে বলা হয় মাতৃভাষা। সারা দুনিয়ায় চার হাজারেরও বেশী মাতৃভাষা চালু আছে। যে যে ভাষায় তার মায়ের মুখ থেকে কথা শেখে সেটিই হয় তার ভাষার নাম। আমরা মায়ের মুখ থেকে বাংলা ভাষায় কথা বলতে শিখেছি। তাই আমাদের ভাষার নাম বাংলা ভাষা। পৃথিবীর এই অংশে বাংলা অনেক পুরানো ভাষা। এই উপমহাদেশে প্রায় হাজার বছর স্থায়ী মুসলমান শাসন আমলেরও আগে এই ভাষার জন্ম। পরে সুলতানী আমলে সুলতানদের যত্নে এই ভাষার লালন-পালন ও বিকাশ ঘটে। সে আমলেই এই ভাষায় জনপ্রিয় পুঁথি সাহিত্য রচিত হওয়া ছাড়াও বহু সংখ্যক ধর্মীয় গ্রন্থ অনূদিত হয়। এভাবেই এ ভাষা গোটা উপমহাদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতেই বাংলা ভাষায় কথা বলা ও লেখালেখি হয়ে থাকে। সারা দুনিয়ার প্রসিদ্ধ ভাষাসমূহের মধ্যে বাংলা ভাষার স্থান অনেক উচ্চে।

বড় হলে তোমরা জানবে যে, ভাষার সঙ্গে রাষ্ট্র ক্ষমতা অথবা রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে চলে ভাষা। উন্নত ভাষাকে অবলম্বন করেই উন্নত হয় সে জাতির শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি। পণ্ডিতজনের মতে, যে জাতির উন্নত ভাষা নেই, সে জাতি জাতিপদবাচ্য হওয়ার অযোগ্য।

বর্বর যুগে এই উপমহাদেশের ভাষা বলতে তেমন কিছু ছিল না। 'সংস্কৃত' নামে যে ভাষাটি ছিল বলে ব্রাহ্মণরা এখনো দাবী করে- তা ছিল অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য। সারা উপমহাদেশে এক শ্রেণীর শোষক ও লুণ্ঠনকারীরা এই ভাষা বুঝতো। মুসলমান শাসন আমলে এই উপমহাদেশের সরকারী ও আইন-আদালতের ভাষা ছিল ফার্সী। পরে এ দেশে সম্প্রসারিত হয় বাংলা ভাষার। সরকারী দলিল-দস্তাবেজ ছাড়াও বাংলা ভাষায় শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে।

মুসলিম শাসনের প্রায় এক হাজার বছর পর এ দেশে ইংরেজ শাসন আমলে সরকারী ভাষা হয় ইংরেজী। বাংলা ভাষা শুধুমাত্র শিল্প-সাহিত্যের ভাষা হিসেবেই অবশিষ্ট থাকে। এ সময়ে বাংলা ভাষায় বিপুল সংখ্যক পুঁথি ও সাহিত্য গ্রন্থ রচিত হয়।

ইংরেজ উত্তরকালে এই উপমহাদেশে দু'টি পৃথক দেশ গঠিত হয় তার একটি ভারত অপরটি পাকিস্তান। এই পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার কথা দু'টি। একটি বাংলা অপরটি উর্দু। অবশ্য পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী জনগণ বাংলা এবং উর্দু দু'টি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত ছিল। কিন্তু আগেই বলেছি, ভাষার সঙ্গে চলে রাষ্ট্রক্ষমতা কিংবা রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে চলে ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি। এ কথাটি পাকিস্তানের অবাঙ্গালী অধিবাসীগণ খুব ভালভাবেই বুঝেছিল। সে কারণে বাঙ্গালীদের রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষাকে তারা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে অসম্মত হয়। ফলে, আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই এ নিয়ে উপমহাদেশের পণ্ডিত মহলে শুরু হয় এক গভীর ষড়যন্ত্র।

তখনকার দিনে স্যার সৈয়দ আহমদ স্থাপিত আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল এই উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান বিদ্যাপীঠ। এই বিদ্যাপীঠের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জিয়াউদ্দিন উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রস্তাব করে এক প্রবন্ধ লেখেন।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, উপমহাদেশের দুই বিচ্ছিন্ন খণ্ড নিয়ে গঠিত হয়েছিল পাকিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান এবং খণ্ডিত পূর্ব বাংলা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানের লোকসংখ্যা ছিল পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা কম। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের একক কোন ভাষা ছিল না। সিন্ধী, পাঞ্জাবী, বেলুচী, পস্তু ও উর্দু প্রভৃতি ভাষায় তারা কথা বলতো। পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা। এতদসত্ত্বেও অতি সামান্যসংখ্যক লোকের ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার প্রস্তাব করা হলে আর কিছু হোক আর না-ই হোক, বাংলাভাষাকে কোণঠাসা করে বাঙ্গালীদের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে— এই ছিল লক্ষ্য।

ডঃ জিয়াউদ্দিনের এহেন প্রস্তাবটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার পাল্টা প্রস্তাব করেন। তিনি তার প্রতিবাদে বলেন, উর্দু আমাদের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। আমাদের আইন-আদালত ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উর্দু অথবা হিন্দীকে যদি ব্যবহার করা হয় তবে তা হবে আমাদের জন্য রাজনৈতিক দাসত্বের নামান্তর। ডঃ

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহীদ রফিকুদ্দিন আহমদ।

শহীদুল্লাহর এই প্রতিবাদেই সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনের সূচনা করে। সারা দেশ শুধু আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় সৃষ্টি করে। খুব ব্যাপকভাবে না হলেও বাংলাদেশের সুধী পণ্ডিত মহলে আলোচনা শুরু হয় তখন থেকেই। এ বিষয়ে লেখালেখিও শুরু হয় পত্র-পত্রিকায়।

তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন জনাব আবুল কাসেম। ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান ঘোষিত হওয়ার পরে পরেই তিনি 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি আদর্শভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ডঃ নূরুল হক ভুঁইয়া, জনাব শামসুল আলম, দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ, দার্শনিক আবুল হাসিম, অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, ডঃ হাসান জামান, সানাউল্লাহ নূরী, অধ্যাপক শাহেদ আলী, অধ্যাপক আবদুল গফুর, জনাব রফিকুল্লাহ চৌধুরী প্রমুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের অন্যান্য কলেজের বহুসংখ্যক আদর্শবাদী শিক্ষক, ছাত্র ও আদর্শবাদী বুদ্ধিজীবী এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। পরে দেশের প্রায় সর্বত্র তমদ্দুন মজলিশের শাখা গঠিত হয়। উপরোক্ত সুধীবৃন্দ ছাড়াও ডঃ শহীদুল্লাহ, ইব্রাহিম খাঁ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ মজলিশের আন্দোলনের নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সুধী মহলকে সজাগ করে তোলে। এই প্রশ্নের ভিত্তিতে অধ্যাপক আবুল কাসেম ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটির শিরোনাম দেয়া হয় "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?" পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ পুস্তিকাটি প্রকাশ করে এবং সর্বসাধারণের কাছে প্রশ্নটি তুলে ধরে।

এই পুস্তিকাটিতে বলা হয়েছিলঃ (ক) বাংলাতে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম করতে হবে (খ) বাংলাকে আদালতের ভাষা করতে হবে (গ) বাংলাকে সকল সরকারী অফিসের ভাষা করতে হবে এবং বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাকেই কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা ঘোষণা করতে হবে। তখনকার মত এ সবই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সার্বজনীন দাবী। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের উত্থাপিত এই সকল দাবী দেশের জনগণের দাবীরূপে পরিণত হয় এবং দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এই সকল দাবীর পক্ষে ক্রমবর্ধমানভাবে গণসমর্থন আসতে থাকে। শুধু তাই নয়, চট্টগ্রাম, খুলনা, নোয়াখালী, কুষ্টিয়া, রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নির্বিচার দাবী প্রত্যাখানের ফলে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ছাত্র-শিক্ষক এবং বিভিন্ন শহরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে সর্বপ্রথম ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। শুধু তমদ্দুন মজলিশ নয়, দলীয় ভিত্তিতে ঢাকা এবং অন্যত্র ভাষার দাবীতে আরো অনেক সংগঠন গড়ে উঠে।

এ সময়ে ভাষা আন্দোলনে নতুন উপাদান সংযোজিত হয়। পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রীয় মুদ্রা এবং ডাক ও রাজস্ব টিকিট থেকে বাংলা ভাষা প্রত্যাহার করে শুধুমাত্র উর্দু ও ইংরেজী ভাষা সংযোজন করে। ফলে, ভাষা আন্দোলনে আরো কিছু ঘৃতাহুতি সংযোজন হয় এবং ভাষা আন্দোলন সংগ্রাম পরিষদ এ ব্যবস্থার প্রতিবাদে অধিকতর সোচ্চার হয়ে উঠে। ১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ বাংলা ভাষার দাবীতে প্রথম মিছিল বের করেন।

ঐ সময়ে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সরকারী শিক্ষাসম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা ঘোষণা করার সুপারিশ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ এই অযৌক্তিক এবং ষড়যন্ত্রমূলক সুপারিশের তীব্র প্রতিবাদ করে এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্থলে বাংলাকে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার দাবী উত্থাপন করে। অতঃপর সারাদেশে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে থেমে থেমে আন্দোলন চলতে থাকে।

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৪৮। করাচীতে তখন গণপরিষদের অধিবেশন চলছে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম গণপরিষদ সদস্য জনাব ধীরেন দত্ত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সমমর্যাদা দানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব ধীরেন দত্তের উত্থাপিত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ফলে, প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক এবং সাধারণভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ গণপরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ফেটে পড়ে এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ এক হরতাল পালন করে। এভাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হতে থাকে।

সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সুধী মহলে ব্যাপক নাড়া লাগে। দলীয়ভাবে এবং অনন্যরূপে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদগুলো পরস্পর যোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন বোধ করে। এই বোধে জাগ্রত হয়েই বহুসংখ্যক সংগ্রাম পরিষদের এক যুক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত মতে ১১ই মার্চ ১৯৪৮ দেশব্যাপী সাধারণ হরতাল পালিত হয়।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের এই ক্রম সম্প্রসারণ লক্ষ্য করে খুবই বিপন্ন বোধ করে এবং এই আন্দোলন প্রতিরোধ ও বাংলা ভাষার দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য পুলিশী জুলুম শুরু করে। সে সময়ে পাকিস্তান সরকার কম্যুনিষ্ট বিরোধী নীতি অনুসরণ করে চলছিল। সুতরাং কম্যুনিষ্ট নিরোধ আইন প্রয়োগ করে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন কর্মীদের উপর নির্যাতন শুরু করে। ফলে, অকারণে অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক ও ভাষা আন্দোলন কর্মী নির্যাতিত হয় এবং গ্রেফতার হয়ে জেল হাজতে কষ্ট পেতে থাকে। কিন্তু তাতেও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কোন ক্ষতিই হয়নি বরং আন্দোলন আরো জোরদার হতে থাকে।

অবশেষে প্রতিবাদের প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিষদের সঙ্গে এক আট দফা চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হন।

কিন্তু তবুও একুশে, তবুও গুলী, তবুও রক্ত, তবুও অশ্রু। সে অনেক কথা, অনেক ব্যথা। আজ সব কথা বলা সম্ভব নয়। কাঁদতে কাঁদতে চোখের অশ্রু মুছতে হলেও সে সব কথা আর একদিন, আরো একদিন এবং তারপরে আরো একদিন তোমাদের বলব।

(চলবে)।